ভ্রষ্টকুসুম

ও অন্যান্য

মহীতোষ বিশ্বাস

পুনশ্চ

সূচিপত্র

লেখালেখির দুচার কথা	৯
রবীন্দ্রনাথ ও ফ্যাসিবাদ	১৭
সতীনাথ ও তারাশঙ্কর : একটি তুলনামূলক পাঠ	৩২
মহাশ্বেতা দেবী	৪৩
অদ্বৈত মল্লবর্মণ : পিছিয়ে থাকা সমাজের এক অগ্রণী কথা-কোবিদ	৫৫
দাম্পত্য-জীবনের আলোকে অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	৬৫
আলোর দিশারি শ্রীরামকৃষ্ণ	৭৫
কথামৃতে গল্পকার শ্রীরামকৃষ্ণ	৮৯
স্বামীজিকে নিয়ে লেখা হল না	১১৪
ভগিনী নিবেদিতা : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব	১২২
ভ্রষ্ট কুসুম	১৪৪
কল্যাণ	১৪৯
একটি বিরল ব্যক্তিত্ব	১৬২
কানাইদা	১৬৮
সতীশবাবু—আমার মাস্টারমশাই	১৭০
একটি স্মরণ	১৭৩
বাকড়ী স্কুল ও কিছু উপকথা	১৭৫
একটি চিঠি	১৮০
অবর বেলায় পাড়ি	১৮৪
এক যে ছিল পুতুল	১৯০
বাংলা লোকসাহিত্য প্রসঙ্গে	১৯২

॥ লেখালেখির দুচার কথা ॥

যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁদের সেহ লেখালেখির জীবনের একটা সূত্রপাত থাকে। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতো। আমারও যৎ-সামান্য লেখালেখির ব্যাপারে দু-চারকথা বলার আছে।

আমার সাহিত্য-সৃষ্টির যে যৎ-কিঞ্চিৎ ক্রিয়া-কর্ম, তার সূত্রপাত ঘটেছিল গদ্য নয়, পদ্য দিয়ে।

পুব-বাংলার একটি ভূমি-লগ্ন কৃষি-কেন্দ্রিক পরিবারে ১৯৩৯-এর নভেম্বরে আমার জন্ম। শহর থেকে সুদূরে একান্ত চাষি-অধ্যুষিত সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কিছুটা শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল ব্রাহ্ম সমাজের আনুকূল্যে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি হাইস্কুল। সেই স্কুলেই লেখাপড়া শুরু আমার। মা বাবা নিরক্ষর। আমি সর্বকনিষ্ঠ। দাদাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলে যাতায়াত করে। মেজদা বাইরের কলেজ থেকে বিএ পাস করে শিক্ষকতা করছে গ্রামের ওই স্কুলেই। দাদাদের দেখাদেখি স্কুলে যাওয়া শুরু হয় আমারও। পড়াশুনো ব্যাপারটাকে খুব কিছু জটিল মনে হয়নি কোনোদিনই। ক্লাসে প্রথম স্থানটা অধিকার করা একচেটিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এরই মধ্যে পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে ছন্দ মেলানোর ভূত চাপলো মাথায়। ওপর ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র কবিতা লেখার চেষ্টা করত। আমিও ভিড়ে গেলাম তাদের দলে। প্রতিদিনই চার পাঁচটা করে কবিতা লেখা চাই। কাগজ বেশ দুর্মূল্য। একটি দরিদ্র পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ একটি অনাদৃত ছেলের পক্ষে ক্লাসের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের বাইরে কবিতা-লেখা মকশো করার জন্য এন্তার কাগজ সংগ্রহ করা বেশ কঠিন। এক দূর সম্পর্কের মামা তার এই ভাগ্নে-পুঙ্গবটির কবি-প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হয়ে দায়িত্ব নিল কাগজ পরিবেশনের। ফলে, প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেতে লাগল কবিতার সংখ্যা। সে সবই তো কোথায় হারিয়ে গেছে। গেছে, ভালোই হয়েছে। তবু তার দুএকটি পংক্তি মনে ভাসে এখনও। যতদূর মনে পড়ে, তখন ক্লাস ফোর কী ফাইভের ছাত্র ছিলাম। এই সময়কার দুটো কবিতার একটু ভগ্নাংশ অবশিষ্ট আছে স্মৃতিতে। গ্রামে রথের মেলা

বসত। বর্ষার কাদা-পথে রথ দেখতে যাওয়ার বর্ণনা—'রথ এসেছে, রথ এসেছে, রথ এসেছে রে,/রথ রথ রথ/আষাঢ় মাসের আছাড় খেয়ে/চিনে চলরে পথ/রথ রথ রথ।' —ইত্যাদি। আবার বসন্ত কালের বর্ণনা—'বসন্ত কি আবার এলোরে/গাছে গাছে উঠল ডাকি/দোয়েল কোয়েল হাজার পাখি/চন্দনা পিক বন্দনা গায়/নূতন বোলে ধরার কোলেরে/বসন্ত কি আবার এলোরে।/নতুন বধূ কলসি কাঁখে/ঘাটের পথে ঘোমটা ফাঁকে/চমকে ওঠেরে,/বসন্ত কি আবার এলোরে!'/ —ইত্যাদি।

স্কুলের পড়াশুনো আর কবিতা লেখা, দুটোই চলল সমান তালে পাল্লা দিয়ে। বিপর্যয়টা শুরু হল ক্লাস সেভেনে উঠেই।

আমাদের ওই অঞ্চলটা ছিল পুরো চাষি এলাকা। চাষিদের মধ্যেও নানা ভাগ—ছোটো চাষি, বড়ো চাষি, ভাগ চাষি। ছোটোখাটো জোতদারও আছে। শহরের অনেক চাকুরিজীবী ভদ্রলোক গ্রামে জমি কিনে চাষিদের দিয়ে বর্গাচাষ করাতেন। তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ। ভঙ্গ-বঙ্গে পুব-বাংলার নাম হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৮ সাল নাগাদ আমাদের ওই অঞ্চলের চাষিদের মধ্যে শুরু হল তেভাগা-আন্দোলন। চাষিদের মধ্যে এই জাগরণ ঘটালেন তখনকার অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। ছোটো বড়ো অনেক নেতার আগমনে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগল ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলটি। ভবানী সেন, হরেকৃষ্ণ কোঙার, কৃষ্ণবিনোদ রায়, মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল, অমল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে দেখেছি চাষিদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালাতে। চাষিদের মধ্যে দাবি উঠল—'লাঙল যার, জমি তার', 'আধা নয়, তেভাগা চাই', 'দালাল হালাল করো' ইত্যাদি। প্রথমদিকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সুযোগ্য পরিচালনায় চাষিরা যথেষ্ট সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তেভাগা কায়েম করে। এরপরেই পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে চাষিদের বিরুদ্ধতায় নামে জোতদাররা। শুরু হয় সংঘর্ষ। চাষিদের হাতে খুন হয়ে যায় দুজন জোতদার। এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড পুলিশি অত্যাচার। পূর্ব পাকিস্তানের শিশু-রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-নায়করা যে শিশু নয়, তারা যে আস্ত দানব, সেটা বোঝা গেল অচিরেই। বহু চাষিকে ধরে পোরা হল জেলে। আমাদের স্কুলের অনেক মাস্টারমশাইয়ের নামেও এল গ্রেফতারি পরোয়ানা। স্কুল বন্ধ করে দিয়ে স্কুলে বসানো হল মিলিটারি ক্যাম্প। দমন নিপীড়ন রইল অব্যাহত। সেই বাল্যবয়সেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে অত্যন্ত কাছের থেকেই এগুলো দেখেছি আমি। তেভাগা-আন্দোলন-ভিত্তিক আমার 'পায়ে পায়ে পথ' উপন্যাসটির 'বিষান'

চরিত্রটি আমার ওই বয়সের আদলে রচিত। যা হক, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আমাদের স্কুলটি। আমার স্কুল-শিক্ষক দাদা পুলিশি নির্যাতন এড়াতে চলে এল পশ্চিমবঙ্গে। এদিকে আমার তখন ক্লাস সেভেন চলছে। স্কুল বন্ধ হয়ে গেল তো চুকে গেল আমার লেখাপড়ার পাটও। ফলে আমি তখন একেবারেই মুক্ত-কচ্ছ। খালে বিলে মাছ ধরে, মাঠে গোরু চরিয়ে, ধানখেতে কাজ করে, এখানে-সেখানে যদৃচ্ছা ঘুরে বেড়িয়ে দিনগুলো কেটে যেতে লাগল মহানন্দে। কিন্তু কবিতা লেখার বাতিকটা বন্ধ হয়নি। বরং সেটা চলল আরো জোর কদমে। স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলেও গল্পের বই পড়ার আগ্রহটা ছিল প্রবল। কিন্তু অত বই কোথায় পাব? স্কুলে যখন পড়তাম, তখন স্কুল লাইব্রেরির আমার উপযোগী সব বই-ই পড়ে ফেলেছিলাম। ছোটোবেলায় মেলায় ঘুরে ঘুরে জোগাড় করতাম পরিত্যক্ত খবরের কাগজের ঠোঙা। সেগুলো বাড়ি এনে আঠার ভাঁজ খুলে লেখাগুলো গিলতাম গোগ্রাসে। এই করতে গিয়ে একবার এক বড়ো মেলায় হারিয়ে গিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিলাম বাড়ির লোকজনের। স্কুল ভেঙে গিয়ে যখন অবাধ স্বাধীনতায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন হঠাৎই পরিচয় হল 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির'-এর বঙ্কিম রচনাবলি এবং শরৎ রচনাবলির সঙ্গে। আমার এক প্রতিবেশী জ্যাঠা ছিলেন স্বল্প-শিক্ষিত কিন্তু অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী। শুনলাম, বেশ কিছু বই আছে তাঁর ঘরে। বইগুলো পড়ার জন্য আবেদন জানালাম জ্যাঠার কাছে। রাজি হলেন জ্যাঠা। সকালবেলায় তাঁর বাড়িতে গেলে একটা বই দেবেন। তাঁর ঘরে বসে ঘণ্টা তিনেক পড়ে আবার ফেরত দিয়ে আসতে হবে বইটা। আর এর বিনিময়ে জ্যাঠার যে দুটো দুধেল গাভি আছে, সে দুটোকে বিকেলবেলায় তিন ঘণ্টা ঘাস খাইয়ে আনতে হবে মাঠে। আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। বঙ্কিম রচনাবলি, শরৎ রচনাবলি, 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকা, এবং আরও কিছু বই পেয়ে গেলাম জ্যাঠার ঘরে। সকালবেলায় তিনটে ঘণ্টা যে কীভাবে কেটে যেত, টেরই পেতাম না। আর বিকেলবেলায় জ্যাঠার গোরু দুটো ঘাসের মাঠে ছেড়ে দিয়ে খেতের আলে বসে সকালবেলায় পড়া বিষয়গুলো নিয়ে আবোল-তাবোল ভাবতাম। এভাবেই অবাধ স্বাধীনতায় কেটে গেল আমার জীবনের দুটো বছর। তখন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু একটু ভাবতে শিখেছি। এই বিদ্যাশিক্ষাহীন, স্বেচ্ছাচারী, শৃঙ্খলাহীন জীবনের পরিণাম যে শূন্য, সেটা অনুভব করতে শিখলাম ধীরে ধীরে।

একদিন রাতের অন্ধকারে যৎসামান্য কয়েকখানা প্রিয় বই ঝোলায় করে ঘাড়ে চাপিয়ে সীমান্ত পার হয়ে চলে এলাম এ বঙ্গে দাদার কাছে। দাদা তখন

এ দেশে একটি হাইস্কুলে স্বল্প বেতনের শিক্ষক। উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির অবস্থাও বড়োই করুণ। যা হক, ভরতি হলাম সেখানে। গত দুটো বছরে আমার ক্লাস সেভেন এবং এইটে পড়ার কথা ছিল। পড়া হয়নি। কিন্তু দাদা দুটো বছর নষ্ট না করে ১৯৫৩-র গোড়ায় আমাকে ভরতি করিয়ে দিল ক্লাস নাইনে। গত দু বছর পড়াশুনোর সঙ্গে যোগ না থাকায় এবং দু ক্লাস ওপরে ভরতি হওয়ায় খেসারত দিতে হল। একেবারেই অথই সমুদ্রে পড়লাম। দাদার স্বল্প আয়ের সংসারে ভালো জামা-কাপড় দূরের কথা, ক্লাসের সব বই জোগাড় করার সঙ্গতিও ছিল না। প্রতিবেশী একজন সহপাঠী ধনী-পুত্রের কাছ থেকে বই-পত্রের সাহায্য নিয়ে পড়াশুনো চালাতে লাগলাম। ১৯৫৫ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ফল বের হলে দেখলাম, বেশ সম্মানজনক ভাবেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। কিন্তু, এসব কথা অবান্তর। কথা হচ্ছিল আমার লেখালেখির বিষয় নিয়ে। স্কুলে ভরতি হয়ে অভাব-অনটন, লেখাপড়ার চাপ—এ-সবের মধ্যেও কিন্তু কবিতা লেখার বাতিকটা মরে যায়নি। মাঝে মাঝে হলেও কবিতা লেখাটা চলছিলই। উৎসাহ দেবারও অনুরাগী জুটে গেল দুএকজন। তখন পুরোপুরি নিষিদ্ধ না হলেও কংগ্রেসি শাসনে কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের মধ্যে একটা লুকোচাপার ভাব ছিল। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী আত্মত্যাগী প্রকৃত মার্কসবাদী কর্মী কমিউনিস্ট পার্টির কাজ চালাতেন সংগোপনে। এ-সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র ছিল 'স্বাধীনতা' পত্রিকা। আমাদের স্কুলের সামনের রাস্তার পাশে দুটো বাঁশের খুঁটির গায়ে মুলি বাঁশের বেড়া টানিয়ে সেখানে প্রতিদিন কোনো স্বেচ্ছাসেবী কমরেড আটকে দিতেন 'স্বাধীনতা' পত্রিকা। অনেককেই দেখতাম, রাস্তায় যাওয়া-আসার ফাঁকে এক ঝলক দেখে নিতেন এ পত্রিকাটা। আমারও নজর পড়ল পত্রিকাটার ওপর। স্কুলের টিফিনের সময় সবাই যখন হুড়োহুড়ি আর খেলাধুলো নিয়ে ব্যস্ত, আমি তখন চেষ্টা করতাম পত্রিকার লেখাগুলো পড়ার। রবিবারের 'কিশোর বাহিনী'র পাতায় ছাপা হত গল্প কবিতাও। ওই লেখাগুলোর আকর্ষণই ছিল আমার কাছে সব থেকে বেশি। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে একসময় মনে হল, এ-রকম তো আমিও লিখতে পারি। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একটা খাম জোগাড় করে গোটা দুয়েক কবিতা পাঠিয়ে দিলাম 'স্বাধীনতা' পত্রিকার অফিসে। এবং কী আশ্চর্য, কয়েক সপ্তাহ বাদেই রবিবারের পাতায় ছাপা হয়ে গেল আমার একটা কবিতা। এটাই আমার প্রথম মুদ্রিত কবিতা। নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখে উল্লাস তো হবেই। এরপরে

আরও বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হল 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। 'যুগান্তর'-এর 'ছোটোদের পাততাড়ি'-তেও ছাপা হয়েছিল দুটো কবিতা। এবং এগুলোও সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কোথায়!

তবে, এখানে একটা কথা। স্কুলে পড়ার সময় নিয়মিত কবিতা লেখার চর্চা এবং তার দুচারটে প্রকাশিত হতে থাকলেও, গল্প বা গদ্যজাতীয় কিছু লেখার চিন্তা মাথায় আসেনি তখনো। ১৯৫৫-য় স্কুল পেরিয়ে ভরতি হলাম কলকাতার কলেজে। ট্রেনে যাতায়াত। দেখার জগৎ এবং অভিজ্ঞতার সীমা বাড়তে লাগল ক্রমেই। ট্রেনে বাদাম-বিক্রি-করা একটা ফেরিওয়ালা ছেলেকে নিয়ে হঠাৎ একদিন লিখে ফেললাম একটা ছোটো গল্প। একটু ইতস্তত করেও গল্পটা পাঠিয়ে দিলাম 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। এটাই আমার লেখা প্রথম গল্প। গল্পটা ছাপাও হল। খেপে খেপে লেখা আমার আরও কয়েকটা গল্প প্রকাশিত হল 'স্বাধীনতা'য়। শারদীয়া পুজোর সময় আশেপাশের ক্লাবের উৎসাহী সভ্যদের আগ্রহে প্রকাশিত হত দুচারটি মরশুমি পত্রিকা। তাদের আহ্বানে সেখানেও গল্প দিয়েছি। ছাপাও হয়েছে। এবং এসব লেখাও আজ চলে গেছে নিরুদ্দেশে। গল্প-লেখার চর্চাটা অনিয়মিত হলেও কবিতা লেখায় কিন্তু ভাটা পড়েনি কখনো। এইভাবে কেটে গেল গোটা ছাত্র-জীবনটা। ছোটো-খাটো পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু কবিতা এবং দুচারটে গল্পও প্রকাশিত হতে লাগল অনিয়মিত ভাবে।

১৯৬১-তে এমএ পাস করার পর শুরু হল চাকরি খোঁজার পালা। এদিকে হঠাৎই জড়িয়ে পড়লাম সংসারে। নানারকম শূন্যতা, হতাশা—তারই মধ্যে নানা আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার দোলা। এরই মধ্যে একটু নিরিবিলি বসলেই মনের মধ্যে ভেসে উঠত আমার জন্মভূমি—আমার ফেলে-আসা গ্রামের মায়াবী ছবি। খাল বিল খেত-ভূমির সেই উদার প্রসার বড়ো আবিষ্ট করে তুলত মনটাকে। এগুলোকে রূপ দেবার জন্য আস্তে আস্তে কলম উঠে এল হাতে। যেটুকু লিখি, তার থেকে ভাবি বেশি। এবং এভাবেই লেখা হয়ে গেল আস্ত একটা উপন্যাস। নাম দিলাম 'জল মাটি মন'। 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল উপন্যাসটি (১৯৬৫-৬৭)। উপন্যাসটিকে বই আকারে প্রকাশ করতে গিয়ে নানারকম বিভ্রাটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সেসব কাটিয়ে ১৯৭৪-এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হল 'মাটি এক মায়া জানে' এই নতুন নামে। উপন্যাসটি সমাদৃত হয়েছিল। এর পরে বেরিয়েছে আমার আরো চারটি উপন্যাস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার পি-এইচ্ ডি-র